দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 2016
পৃ. ৬ কলাম ৬

শিক্ষকের মর্যাদা ও জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্ন

ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক রিপন

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছে। ব্রিটিশ আমলে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে পিছিয়ে পড়ে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অধিকহারে শিক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভক্তিতে শিক্ষিত হিন্দুরা পশ্চিম বঙ্গে চলে যাওয়ায় সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কমে আসে। পরবর্তীতে পাকিস্তানী শাসনে বৈষম্যের শিকার এদেশের বাঙালিরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ পাবে দূরে থাক, শিক্ষার সেরা মাধ্যম মায়ের ভাষার অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এতে জীবন দিতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। পাকিস্তানী অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। বিভাজনের উষালগ্নে সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশ, যাঁদের অনেকে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অর্থাৎ শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কারিগর, তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতিতে নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা বিকাশে বঙ্গবন্ধু-সরকার ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর করুণ মৃত্যুতে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে সদ্যপ্রসূত রাষ্ট্রটি। দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরশাসনে বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতির অস্থিরতায় শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আধুনিকায়ন এবং আন্তর্জাতিকীকরণে সামষ্টিক উদ্যোগ ও কার্যক্রমের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। সম্ভবত এভাবে, গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ চোরাবালিতে পড়ে যাচ্ছে। অষ্টম জাতীয় পে-স্কেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবনমন এরকম ইঙ্গিতই বহন করে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মাঝেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অর্জন রয়েছে, যেগুলো মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন আকারে দৃশ্যমান করার প্রাতিষ্ঠানিক রেওয়াজ না থাকায় শিক্ষকরা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছেন।

উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রভাব শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। প্রভাবগুলো আবার স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়, ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় পলিসি তৈরি হয়, ফলে উচ্চশিক্ষার সুফল চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। মার্কিন গবেষকদের মতে উচ্চশিক্ষিতরা কর্মজীবনে বেশি আয় করে, রাষ্ট্রকে বেশি পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করে, বেকারত্ব মোকাবিলা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে বেশি শক্তিশালী হয়। সামাজিক জীবনের গুণগতমান উন্নয়নে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নানা সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে, রক্তদান করে, ধূমপানে কম আসক্ত হয় এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। জেন্ডার-সমতা উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীদের উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গবেষণার আরেকটি মজার তথ্য হলো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের সন্তানরা প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত লেখাপড়া রপ্ত করতে পারে, তাদের জ্ঞান-দক্ষতা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের সন্তানের তুলনায় বেশি হয়। ইতালীয় গবেষকরা দেখেছেন, নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট জ্ঞান ও প্রযুক্তি ঐ অঞ্চলে ফার্ম ও শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। চলমান ফার্ম ও শিল্প-কারখানায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জ্ঞানের, ছড়িয়ে পড়ছে বৃহত্তর অঞ্চলে, গড়ে উঠছে নতুন নতুন এন্টারপ্রাইজ, তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান, উন্নত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাব নিয়ে এরকম গবেষণা করলে হয়তবা উপরোক্ত ফলাফলই বেরিয়ে আসবে। এ ধরনের গবেষণা স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করতে পারে, কিন্তু এরূপ কর্ম চোখে পড়ে না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্জন মূল্যায়ন করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে এর পাহাড়সম অর্জনের কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। বাকৃবির অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী একজন শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব স্নাতক পর্যায়ে ক্লাস নেয়া এবং স্নাতকোত্তর

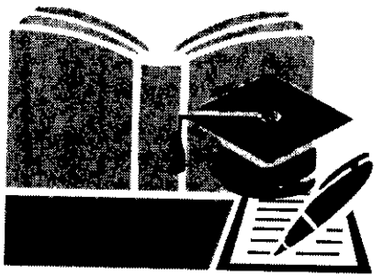

পর্যায়ে ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি এমএস (মাস্টার্স ডিগ্রি) ও পিএইচডি ছাত্রদের গবেষণা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে থিসিস লেখায় সক্ষম করে ডিগ্রি অর্জনের যোগ্য করে তোলা। অনেক পাঠকের হয়তবা অজানা, স্নাতকোত্তর গবেষণার খরচ যোগানের জন্য বাকৃবির প্রাতিষ্ঠানিক কোন অর্থ সংস্থান নেই। শিক্ষকরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। প্রকল্প লেখার যোগ্যতা অর্জন করেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময়। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বাকৃবিতেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মেধাবী শিক্ষার্থীরা কঠোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তির হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের পর সর্বোচ্চ মেধাবীরা শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নেন। শিক্ষা জীবনের সমস্ত ভাল ফলাফলকে পুঁজি করে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি লাভের মাধ্যমে বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডিগ্রি অর্জনে যান। বর্তমানে সহযোগী প্রফেসর ও প্রফেসর পর্যায়ে বাকৃবির প্রায় শতভাগ শিক্ষক পিএইচডি ডিগ্রিধারী। শিক্ষকদের ডিগ্রি অর্জনে অফিসিয়াল অনুমতি ছাড়া বাকৃবির কোনপ্রকার বিনিয়োগ নেই। উচ্চশিক্ষায় অর্জিত জ্ঞানের অব্যাহত চর্চা ও মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্রদের গবেষণা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জন্ম নেয়া একেকটি প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। ধান, মাছ, শাক-সবজি, ফল, হাঁস-মুরগি,গবাদিপশু ইত্যাদির উচ্চফলনশীল জাত ও ফার্মিং পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে অসংখ্য ফার্ম ও ভ্যালু-চেইনের সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ধনী-গরীব, পুরুষ-মহিলা, কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন-জীবিকা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বাকৃবি থেকে সৃষ্ট কৃষিবিদরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন, এবং পেশাগতভাবে শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মত জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাকৃবির প্রত্যাসন্ন প্রভাবে ময়মনসিংহ এখন 'কৃষির মক্কা'-এর রূপ লাভ করেছে। কৃষিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কল্যাণে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সবজি উৎপাদনে চতুর্থ, মাছ উৎপাদনে পঞ্চম, এবং প্রধান খাদ্য ভাতের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চাল রপ্তানি করছে। কৃষির বহুমুখী সম্ভাবনার হাতছানিতে আরও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হচ্ছে, একডজনেরও বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা চালু হয়েছে, তৈরি হচ্ছে হাজারো গ্র্যাজুয়েট। বাকৃবি বিজ্ঞানীদের পাবলিকেশন গুগল সাইটেশন ইনডেক্স, রিসার্চ গেট স্কোর সিমাগো ইম্প্যাক্ট ক্যাটাগরি ইত্যাদিতে জায়গা করে নিয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে বাকৃবির মত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও ভূমিকা রেখেছে, যেগুলো দৃশ্যমান হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংজ্ঞা ও অবদান সকলের নিকট পরিষ্কার হতো।

কৃষিতে উচ্চশিক্ষার উপরোল্লেখিত সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাকৃবি ক্যাম্পাসে তাঁর আগমনের পূর্বে সরকারি চাকরিতে কৃষিবিদদের পদমর্যাদা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণিতে। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মহান নেতার আগমন বাকৃবির পরিবারকে উদ্বেলিত করে, কৃষি শিক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি কৃষিবিদদের মর্যাদার বিষয়টি তার সামনে তুলে ধরা হয়। ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের ক্লাস ওয়ান মর্যাদায় উন্নীত করেন। এ থেকে বাকৃবি তথা গোটা কৃষিবিদ পরিবার অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করে, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় ফিরে আসে নতুন প্রাণশক্তি। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে সৃষ্ট 'বঙ্গবন্ধুর অবদান/কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান' - স্লোগান দিয়ে কৃষিবিদরা মহান নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের পদমর্যাদা উন্নত না করলে এদেশে কৃষিখাত এতদূর এগুতো না। সপ্তম থেকে অষ্টম পে-স্কেলে শিক্ষকদের অবনমন হয়েছে, শিক্ষকরা তাঁদের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আন্দোলনে নেমেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্বাসে শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরে গেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের আশ্বাসের ইতিবাচক প্রতিফলন না ঘটলে মেধাবী ছাত্ররা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসবে না, মেধাবী শিক্ষক তৈরি হবে না, মেধাশূন্য হবে গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার অর্থ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও রাজনৈতিক ডামাডোলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গবেষণার মান নিম্নমুখী--এ কথা সত্য। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক নেতৃত্ব জোরদারের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার সার্বিক অবস্থার আধুনিকায়ন প্রয়োজন - যা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী সন্তান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা অপরিহার্য।

লেখক : প্রফেসর, একোয়াকালচার বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
Email: mmhaque1974@yahoo.com